

ইতিহাসের কয়েকজন প্রখ্যাত নারী-বিজ্ঞানী

খালেদা ইয়াসমিন ইতি

সম্প্রতি ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন নারী আনুশাহ আনসারি মহাকাশ জয় করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। বিশ্ববাসী তার সাফল্যের হাসির সঙ্গে হেসেছেন আর আশাব্লিত হয়েছেন পৃথিবীর অনেক নারী। বিজ্ঞানের কল্যাণে আনুশাহর এই জয় সহজ মনে হলেও এর পেছনের ইতিহাস এত সহজতর নয়। আনুশাহর এই ই’ছা ও অভিযানের প্রেরণা হয়ে আছেন উত্তরসহরী কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ নারী। যাদের পৃথিবীর অনেকেই চেনেন না। জানেন না বিজ্ঞানে তাদের অসাধারণ অবদানের কথা। আমরা আমাদের দেশেও আনুশাহর উত্তরসহরী পেতে চাই। আর সেই প্রত্যাশা নিয়েই এ প্রজন্মের সম্ভাবনাময়ীদের কাছে তুলে ধরতে চাই সেসব জ্ঞানী ত্যাগী নারীদের কথা।

বুঝতে শেখার পর থেকেই কারো কারো মনে এই প্রশ্নটি জাগা স্ভাব্যিক : মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের সংখ্যা এত নগণ্য হতে পারে না। যেভাবেই হোক এক্ষেত্রে আরো অনেক নারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বারবার তা এড়িয়ে গেছেন। ইতিহাসের গুরু “থেকে শেষ পর্যন্ত” লক্ষ্য করা গেছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বত্রই নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাসবিদদের অনিয়ম এবং অবমূল্যায়নের কারণে সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের সংখ্যা ত্রুটিমেই কমে এসেছে। তারপরও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাল ভেদ করে অনেকে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : হাইপেশিয়া, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়্যা, লাইস মিটনার। যদিও বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন তাদের অবদানগুলোকে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে। এই কয়েকজন নারী ছাড়াও ক্যারলিন হারসেল, মেরি অ্যানি ল্যাভয়েসিয়া এবং ডিএনএ গবেষক রোজালিন ফ্রাঙ্কলিনের কথা উল্লেখ করা যায়, যারা তাদের পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে একনিষ্ঠচিত্তে কাজ করেছেন। অথচ ওই সহযোগীরাই এক সময় তাদের অবদানকে ত্রুটিমে অলঙ্কারের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আরো কিছু নারীর কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের অবদান সম্পর্কে নামমাত্র তালিকা করা হয়েছে এবং অন্যদের স্মৃতিচর্চা আমরা জানতে পেরেছি কেবল নিজস্ব কৌতূহল ও আনুষ্ঠানিক নির্দেশনার মাধ্যমে। আর নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অবশিষ্টদের জীবনযাত্রা ও কাজের অস্টিন্য় সম্পর্কে আমরা হয়তো ভবিষ্যতেও কিছু জানতে পারব কি-না সন্দেহ! সর্বোপরি এটাই প্রতীয়মান হয়, নারীরা সভ্যতার উষালগ্ন থেকে পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারবার। হারিয়ে যাওয়া পথের এই সীমাবদ্ধতার মাঝে যেসব নারী বিজ্ঞান জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাদের কথা নিয়ে এই প্রবন্ধ।

হাইপেশিয়া (৩৭০-৪১৭) : বিজ্ঞানে নারীদের মধ্যে যে নামটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব নিয়ে উঠে এসেছে, যার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংস, যার মৃত্যুর সঙ্গে মধ্যযুগীয় অলঙ্কার যুগের

সহচনা হয়েছিল, যার নাম মনে এলে পুরো খ্রিস্টদ্বন্দ্বের আগের ও পরের ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো জানতে ইচ্ছা করে তিনি হলেন হাইপেশিয়া। গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হাইপেশিয়াকে বলা যায় প্রাচীন বিজ্ঞান ও গণিতকে বোঝার একটি দরজা। এই নারী আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের শেষ প্রাণপ্রদীপ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি নাটকও লিখতেন। তিনি ৪০০ অব্দের দিকে নব্য প্লেটনিক ধারার স্কুলের প্রধান হয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টদান ধর্মসহ তখনকার ধর্মগুলো সক্ষমকর্তে অবগত ছিলেন। কিন্তু তা তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন, পরিণত বুদ্ধির জাতির জন্য থাকা উচিত যুক্তিসহ জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম, যা ছিল গ্রিকদের। আমি আলেকজান্দ্রিয়া বসে যথাশক্তি কাজ করে যাচ্ছি। ৪১৭ খ্রিস্টদ্বন্দ্বের কোনো এক গোপহলিবেলায় ধর্মাল্লবরা এই মহীয়সী নারীর শরীর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার দেহ যখন ধর্মাল্লবরা ছিন্নমূলভিন্ন করছিল তখন একবারের জন্যও চেটিয়ে, কেঁদে মিনতি করে জীবন ভিক্ষা চেয়ে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি। যার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের হাতে লেখা পাঁচ লাখ বইয়ের ধ্বংস এবং সেই সঙ্গে সহচনা হয় মধ্যযুগীয় অল্পবয়স্কদের।

সোফি জার্মেইন (১৭৭৬-১৮৩১) : অশ্বদ্বাদশ শতাব্দীর এক অপ্রতিরোধ্য নারী ছিলেন গণিতবিদ সোফি জার্মেইন, যার জন্ম ফরাসি বিপ্লবের সময়, ফ্রান্সের প্যারিসে। তার বাবার নাম ছিল এমব্রোইজ-ফ্রানকোইস (অসনৎডরংব-ঋৎধহপডরং) এবং মায়ের নাম মেরি জার্মেইন (গধৎরব এবংসধরহ) একজন বিপ্লবী সৈনিকের মতো, তার জীবনও কেটেছে অনেক অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমে। মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকেই গণিতের প্রতি তার আগ্রহ দেখা দেয় রোমান সৈনিকের হাতে মহাগণিতজ্ঞ আর্কেমিডিসের মৃত্যুর কাহিনী পড়ে। এ ঘটনা যেন সোফির কৌতূহলকে স্টম্ফুলিঙ্গায়িত করে তোলে। তিনি শুধু বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, গাণিতিক সমস্যায় আত্মমগ্ন থাকা একজন গণিতজ্ঞ কোনো সৈন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে মৃত্যুবরণ করতে হয়! গণিতে তার অবদানের মহাল্যায়ন পেতে সোফিকে জীবনের অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমনকি আজো এটা মনে করা হয় যে, তিনি যে পরিমাণ অবদান রেখেছেন সংখ্যাতত্ত্ব এবং গাণিতিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তার কোনো কৃতিত্বই তাকে দেওয়া হয়নি, শুধু একজন নারী হওয়ার কারণে। বাবা-মা মনে করতেন, একজন নারী হিসেবে সোফির গণিতের আগ্রহ অনুপযুক্ত। যদিও মা-বাবার নজর এড়িয়ে গভীর রাতে তিনি পড়াশোনা শুরু করতেন। কিন্তু একদিন মা-বাবা দেখলেন বিছানায় রাতের পোশাক পরে নিজেকে প্রচণ্ড শীতের মাঝেও তাপ এবং আলো থেকে বঞ্চিত করে গভীর রাতে একটানা পড়াশোনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস চর্চার মাধ্যমে গণিতে সোফির হাতেখড়ি। সামাজিক কারণে ছেলেদের ছদ্মনামে বিখ্যাত গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী : জেএল ল্যাগরেঞ্জ, কার্ল ফেদ্রডারিক গাউস, লিজেভার-জোসেফ ফুরিয়রের যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন। সোফিকে মহালত সন্নিবেশ করা হয় তার সংখ্যাতত্ত্বের জন্য, কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা সহজের ক্ষেত্রেও গণিতে তার অবদান যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ১৮৩১ সালে গণিতবিদ গসের সুপারিশের ফলে গ্যোয়টিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাকে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মেরি অ্যানিং (১৭৯৯-১৮৪৭) : মেরি অ্যানিংকে প্রথম ফসিল অনুসন্ধানকারীও বলা যায়। তার জন্ম ও মৃত্যু ইংল্যান্ডের লাইম রিজিসে। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন বড় মাপের একজন জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞ হওয়ার

জন্য। লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক ওপযঃযুড়ংধুং-এর একটি অনুসন্ধানের জন্য অ্যানিংকে একটি বিশেষ স্টীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি উডসন্স সারীস্প জীবাশ্ম (চষবংরড়ংধুং) জাতীয় প্রাণীর ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যানিং বাবার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন কীভাবে ফসিল উত্তোলনের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে খনন করতে হবে এবং কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। তার ১১ বছর বয়সের সময় একদিন তিনি এক সমতল পাথরে ঢাকা একটি স্থানকে সন্দেহ পোষণ করায় তাকে হামার দিয়ে খনন শুরু করেন। কয়েক সপ্তাহ চেষ্টার পর ৪ ফুট লম্বা একটি মুখম-ল বের হলো। তার ভাই এটাকে সামুদ্রিক ড্রাগন নামে অভিহিত করেন।

১৮৩২ সালে বিখ্যাত প্রত্নজীবাশ্মবিদ জিডিওন মানটেল, যাকে সবচেয়ে প্রাচীন ডাইনোসরের ফসিল শনাক্তকরণের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়, তিনি মেরির নামের শুরুতে যুক্ত করেছিলেন সিংহী ভহ-তাত্ত্বিক মেরি অ্যানিং। খ্যাতনামা এক জার্মান পরীক্ষণবিদ লডউইগ লাইচহার্ডট মেরিকে ডাকতেন প্রত্নজীবাশ্মবিদ্যার রাজকন্যা বলে। মেরি অ্যানিং আসলে জীবদশায় যা করেছিলেন তা-ই তাকে এত বিখ্যাত করেছে, করেছে প্রাচুর্যময়। অ্যানিং শেষে সমুদ্র সৈকতে আপন মনে ঘুরে বেড়াতেন এবং অনেক নিষ্ঠা আর আনন্দরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর নতুন জীবাশ্মের নমুনা খুঁজতেন। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল খুবই কম। কিন্তু তারপরও তিনি প্রত্নজীবাশ্মবিদ্যায় বিশাল অবদান রেখে গিয়েছেন। তার নিজস্ব প্রকাশিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকাশনাও ছিল।

মাদাম মেরি কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪) : তিনিই প্রথম নারী যিনি দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আজীবন তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করে এক অজানা রোগে মৃত্যুবরণের পর তার সফল আইনস্টাইন বলেছিলেন : 'সুপ্রসিদ্ধ মনীষীদের মাঝে একমাত্র মেরি কুরির জীবনই যশের প্রভাবমুক্ত ছিল। নিজের জীবনটা যিনি অপরিচিতের মতো সফলভাবে পরিণত করে গিয়েছেন, সেই চিরকালে নারীর কথা লিখতে বসে আজ আমি নিজের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার অভাব বোধ করছি।' মেরি স্কলোডসকা কুরির জন্ম পোল্যান্ডের ওয়ার্সে রাশিয়ায় অত্যাচারী জার শাসনের নিষেধের সময়। পরিবারে তাকে মানিয়া নামে ডাকত। তার বাবা ব্লান্ডিন্সভ শক্লোদোভস্কি ওয়ার্সে একটি নামকরা কলেজের পদার্থের অধ্যাপক ছিলেন এবং মা ছিলেন একটি নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তার বাবা প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় মেরির পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে আসর বসাতেন।

এক সময় তার পরিবার মারাত্মক অর্থ সংকটে পড়ায় তার বড় বোনের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তিনি ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি মাসিক পাঁচশ রুবলের বিনিময়ে এক অভিজাত রুশ আইনজীবীর বাড়িতে গভর্নসের চাকরি নেন। তাদের দু'বোনের মধ্যে শর্ত ছিল একজনের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর অপরজনের পড়াশোনার খরচ জোগাবে। তাই অনেক মানসিক পীড়নের মধ্যে তাকে তিন বছর চাকরি করতে হয় এবং এরই মধ্যে তার বড় বোন ব্রোনিয়া ডাক্তারি পাস করেন। পছন্দ শর্তানুযায়ী এবার মেরি তার বোনের আর্থিক সহায়তায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন ব্রুনা কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান, সেখানে তিনি

বিজ্ঞান ক্লাসে যোগ দিতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিব তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন, ‘বিজ্ঞান মেয়েদের জন্য নয়, তাই তিনি যেন রল্লব্দন শিক্ষা ক্লাসে যোগ দেন।’ পরিচয় ঘটে এক ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ারে কুরির সঙ্গে, যিনি ইতিমধ্যে চুম্বকত্ব ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পিয়ারে কুরি তার জীবনকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা রাখেন। তারা বিয়েও করেন। ১৮৯৮ সালেই এই দম্পতি প্রথমে পিচব্লেন্ড থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়াম ($^{84}\text{Pu}_{239}$) এবং পরে রেডিয়াম (Ra) আবিষ্কার করেন, যা ইউরেনিয়াম [$^{92}\text{U}_{239}$] থেকে দশ লাখ গুণ বেশি শক্তিশালী। এই রেডিয়ামের ব্যবহার অপরিসীম। তাদের কাজের অবদানস্বরূপ ১৯০৩ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি কুরি দম্পতিকে ডেভি পদক প্রদান করে এবং এ বছরই পদার্থবিজ্ঞানে হ্যানরি বেকেরেলের সঙ্গে তাদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

তিনি রেডিয়ামকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আলাদা করতে সক্ষম হন এবং পুনরায় তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তার এ কৃতিত্বের জন্য ১৯১১ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে তিনি একা নোবেল পুরস্কার পান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আহত সৈনিকদের যিনি দিয়েছেন একাগ্র সেবা, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের দিয়েছেন উপদেশ ও পরামর্শ। সর্বোপরি নিজের স্ট্রাস্টোর দিকে না তাকিয়ে যিনি ঢেলে দিয়েছেন তার সবটুকু সময়। লাইস মিটনার (১৮৭৮-১৯৬৮) : পরমাণু বা নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী এই নারী ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি কখনো মানবিকতাকে হারাননি। যাকে এমিল ফিশার ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তিনি একজন অপরূপা নারী ছিলেন, তাই অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে মনোযোগ নশ্বর হবে বলে। তাকে নোবেল পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল তারই ৩০ বছরের সহযোগী অটোহ্যানের কৌশলগত কারণে। অথচ ফিশন বিক্রিয়ার তিনিই পথিকৃৎ বা ব্যাখ্যাদাতা। যাকে বলা হতো ‘এটম বোমা তৈরির ইহুদি-মাতা’ তিনি পরমাণু বোমা তৈরির কাজ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সব কিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন বিজ্ঞান জগতের এক কিংবদন্তির নায়িকা।

তার গবেষণার একটি বিষয় ছিল ‘মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার (cosmic process) ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার তাৎপর্য’। একটি সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করে তা প্রচার করল কসমেটিক প্রক্রিয়া (cosmetic process) শিরোনামে। এ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, এ যেন পুরা ‘ষাষিত সমাজের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার ফল। যে ধারাবাহিকতা একজন সৃষ্টিশীল নারীর প্রতিভাকে এমন নির্মমভাবে পরিহাস করতে শিখিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের [১৯৩৯-১৯৪৫] আগ পর্যন্ত আমেরিকাতে তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এই নারীকে নাৎসিদের জন্য রিক্ত হাতে জার্মান থেকে পালাতে হয়েছিল। পলায়নের পর স্ট্রাস্টোর থেকে মিটনার চিঠিতে লিখেছিলেন : নিজেকে আমার ঝড়ে উল্কেল্ট যাওয়া পুতুলের মতো মনে হয়। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কিছু ঘটনা আমাদের সঙ্গে বল্লব্দসুলভ ভাব প্রকাশ করে কিন্তু তার কোনো নিজস্ব স্বকীয়তা নেই। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কতটা নির্মমভাবে কাটিয়েছেন।

এমি নোয়েথার (১৮৮২-১৯৩৫) : এমির জন্ম জার্মানির এরল্যাঞ্জে, মৃত্যু ব্রাইন মাউর পেনসিলভেনিয়ায়। নোয়েথারের জীবনালেখ্য অঙ্কিত ছিল গাণিতিক মহত্ব দ্বারা। জার্মানির গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর তিনি যে কাজ করেন তা এখনো নোয়েথারের তত্ত্ব নামে পরিচিত। তিনি

গোয়েটিংগেনে দীর্ঘদিন বিনা বেতনে নামমাত্র সহযোগী অধ্যাপনার কাজ করেন শুধু একজন নারী ছিলেন বলে। এরপর ১৯০৭ সালে তিনি গণিতের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। নোয়েথার ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোনো ধরনের অর্থ এবং পদবি ছাড়াই এরল্যাঞ্জেনের একটি গণিত ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। সেই সময় তিনি বীজগণিতবিদ আর্নস্ট অটো ফিশচারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন এবং শুরু করেছিলেন সাধারণ, তাত্ত্বিক বীজগণিতের ওপর গবেষণা। যার জন্য পরবর্তীতে তিনি স্ট্রীক্টি পেয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ হারম্যান মিনকোওস্কি, ফেলিক্স ক্লেইন এবং ডেভিড হিলবার্টের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি গটিনজেনের গণিত ইনস্টিটিউটে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ক্লেইন ও হিলবার্টের সঙ্গে আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর কাজ শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিনি দুটো উপপাদ্য প্রমাণ করেন, যা সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং মৌলিক কণা পদার্থবিজ্ঞানের মহল বিষয় ছিল। যেগুলোর একটি এখনো নোয়েথারের উপপাদ্য নামে পরিচিত। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি নারী ছিলেন বলে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হতে পারেননি। তাকে কেবল হিলবার্টের একজন সহকারী হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। হিলবার্ট এবং আলবার্ট আইনস্টাইন তার পক্ষে সুপারিশ করলে ১৯১৯ সালে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি অর্জনে সক্ষম হন, যদিও তখন পর্যন্ত তা বিনা বেতনে ছিল।

তার গাণিতিক কাজগুলো পদার্থবিদ এবং কেলাসতত্ত্ববিদদের জন্য খুবই ব্যবহারোপযোগী ছিল। ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি একজন পরিদর্শনকারী অধ্যাপক হিসেবে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। ১৯৩০ সালে ফদ্বাক্সফোর্টে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ সালে জুরিখে আন্তর্জাতিক গণিত কংগ্রেসে একটি পহর্গাঙ্গ বক্তৃতা দেন। ঠিক একই বছর তাকে গণিতের ওপর একটি সম্মানজনক পুরস্কার একারম্যান-টিউনার মেমোরিয়াল পুরস্কার (Ackermann-Teubner Memorial Prize) প্রদান করা হয়।

রোজালিন ফদ্বাক্সলিন (১৯২০-১৯৫৮) : তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন, একটি স'হল ইহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন রোজালিন ফদ্বাক্সলিন। তিনি ছিলেন একজন অণুজীববিজ্ঞানী এবং ভৌত রসায়নবিদ। যাকে সবচেয়ে ভালোভাবে স্মরণ করা হয় কয়লা, ডিএনএ এবং উদ্ভিদ ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণায় তার বিশেষ অবদানের জন্য। তার মতো আর কোনো নারী বিজ্ঞানীর জীবন এতটা বিতর্কিত এবং কর্মমুখর ছিল না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তিনি ফদ্বাক্সলের প্যারিসে একটি গবেষণাগারে কাজ করেন। এখানেই তিনি রঞ্জন রশ্মি বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল শিখেছিলেন, কাজ করেছিলেন কেলাসতত্ত্ববিদ (Crystallographer) জ্যাকস মিরিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে। খুব সাধারণ কিছু সরঞ্জাম নিয়ে ফদ্বাক্সলিন ডিএনএ'র একক তন্ত্রের উ'চ বিশ্লেষণীয় ফটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

রোজালিন ফদ্বাক্সলিনের এই কেলাস সঙ্কর্ষিত কাজ ওয়াটসন, ক্রিক ও উইলকিনস কর্তৃক উপস্থাপিত ডাবল হেলিক্স মডেলের জন্য পরীক্ষামূলক সমর্থন জুগিয়েছিল। অথচ জেমস ওয়াটসন, ফদ্বানসিস ক্রিক

এবং মরিস উইলকিনসকে ডিএনএ'র ডাবল হেলিক্স গঠনের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলেও রোজালিন ফদ্রাকলিনকে এ অমহান্য কাজের জন্য কোনো কৃতিত্বই দেওয়া হয়নি। অবশ্য এর আগে ১৯৫৬ সালের শরতে রোজালিন ফদ্রাকলিন মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাই ডিএনএ'র গঠন কাঠামো আবিষ্কারের গন্ধপ্লকে এখনো বলা হয় একটি প্রতিযোগিতামূলক ষড়যন্ত্র।

রজার আরলিনার ইয়ং (১৮৯৯-১৯৬৪) : প্রথম আমেরিকান যিনি প্রাণিবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। এই প্রাণিবিদকে সারাজীবনই সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার পঙ্গু মায়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি গবেষণা ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করে গেছেন। তার জীবন কাহিনী হলো দৃঢ়চরিত্র ও অধ্যবসায়ের একটি গন্ধপ্ল। তিনি বড় হন পেনসিলভানিয়ার বারগেটসটাউনে। হাউয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের আর্নেস্ট এভারিট জাম্বেদর অধীনে তার প্রথম বিজ্ঞান কোর্স শুরু করেন। তার গ্রেড কম হলেও তার মধ্যে জাম্বেদর সন্তোষবনা দেখতে পান। জাম্বেদর তাকে গবেষণা করার জন্য ১৯২৭ সালে ম্যাসাচুসেটসে মেরিন বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমন্ত্রণ জানান। তারা গবেষণা করেন সামুদ্রিক প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর। তিনি হাইড্রেশন, ডিহাইড্রেশনের ওপরও গবেষণা করেন। তিনি এ ব্যাপারে এতই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে জাম্বেদর তাকে প্রাণী বিজ্ঞানের একজন সত্যিকারের প্রতিভা বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে জাম্বেদর সঙ্গে সঙ্কর্ক বিঁধিল্পন্ন হয়ে যায়। তিনি মারা যান দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

রোজসা পিটার (১৯০৫-১৯৭৭) : রিকার্সিভ ফাংশন তত্ত্বের (Recursive function Theory) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রোজসা পিটার বিশ্বব্যাপী গণিতবিদদের মধ্যে পরিচিত হয়ে আছেন। আধুনিক গণিতে তার বহুবিধ অবদান রয়েছে। নারী হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়েছে এই স্ত্রীকৃতি। তার জন্ম হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে।

হেলেন সয়ের হগ (১৯০৫-১৯৯৩) : হেলেন সয়ের হগ ছিলেন এমন একজন নারী যিনি নক্ষত্রের কৌতূহল সবার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে খুবই উল্লেখযোগ্য কর্ম সঙ্কর্কদনের মধ্য দিয়ে। তার গবেষণার বিষয় ছিল বর্তুলাকার নক্ষত্রে পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের ওপর গবেষণা। কিন্তু তাকে সবচেয়ে যে কারণে স্মরণ করা হবে তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের কলামের জন্য, যা তিনি লিখেছিলেন ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানে নারীদের প্রবেশের জন্য উৎসাহ ও সাহস জোগাতে। তিনি ১৯২৬ সালে হার্ভার্ড অবজারভেটরিতে বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী হ্যারলো শেপলির সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি রাতের আকাশের অসাধারণ দক্ষ পথিক। তিনি ২০০-এর বেশি গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন। যেগুলো তাকে দীর্ঘ পথে চলতে সহায়তা করেছে। ভেরিয়েবল স্ফারের ওপর তার তালিকা এখনো ব্যবহার করা হয়। তিনি মিক্সিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে দহরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার দহরত্ব পরিমাপের নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন।

দৈনিক সমকালে প্রকাশিত, এবং মুক্তমনায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত।